**নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়**

**ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি**

****

**কোর্স টাইটেলঃ বাংলা সাহিত্য**

**কোর্স কোডঃ GE 1213**

**ইয়ারঃ ০১ টার্মঃ ০২**

**এসাইনমেন্টের বিষয়ঃ** "বনলতা সেন" কবিতায় কবি যেসব প্রাচীন নগরীর উল্লেখ করেছে, তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ।

|  |  |
| --- | --- |
| **প্রেরকঃ** | **প্রাপকঃ** |
| মো. সাইফুল ইসলাম  রোলঃMUH2025033M | লাবণ্য মন্ডল  লেকচারার  বাংলা সাহিত্য  নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় |

**জমার তারিখঃ ২৪-১০-২০২১ ইং**

**বনলতা সেন**

**জীবনানন্দ দাশ**

**(১৮৯৯ - ১৯৫৪)**

**বনলতা সেন কবিতার মূলভাবঃ**

কবিতাটির প্রথম স্তবকে হাজার বছর ব্যাপী ক্লান্তিকর এক ভ্রমণের কথা বলেছেন কবি : তিনি হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথে পথে ঘুরে ফিরেছেন;- যার যাত্রাপথ সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগর অবধি পরিব্যাপ্ত। তার উপস্থিতি ছিল বিম্বিসার অশোকের জগতে যার স্মৃতি আজ ধূসর। এমনকী আরো দূরবর্তী বিদর্ভনগরেও স্বীয় উপস্থিতির কথা জানাচ্ছেন কবি। এই পরিব্যাপ্ত ভ্রমণ তাকে দিয়েছে অপরিসীম ক্লান্তি। এই ক্লান্তিময় অস্তিত্বের মধ্যে অল্প সময়ের জন্য শান্তির ঝলক নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল বনলতা সেন নামের এক রমণী। কবি জানাচ্ছেন সে নাটোরের বনলতা সেন।

কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকে বনলতা সেনের আশ্চর্য নান্দনিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন কবি। বনলতা সেনকে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন অন্ধকারে। তার কেশরাজি সম্পর্কে কবি লিখেছেন : "চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা"; মুখায়ব প্রতীয়মান হয়েছে শ্রাবস্তীর কারুকার্যের মতো। বনলতাকে দেখে গভীর সমুদ্রে হাল-ভাঙ্গা জাহাজের দিশেহারা নাবিকের উদ্ধারলাভের অনুভূতি হয়েছে কবির, যেন একটি সবুজ ঘাসের দারূচিনি দ্বীপ সহসা ঐ নাবিকের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। বনলতা সেনও তার পাখির নীড়ের মতো আশ্রয়ময় চোখ দুটি তুলে জানতে চেয়েছে, "এতদিন কোথায় ছিলেন?"

তৃতীয় স্তবকটি স্তগতোক্তির মতো মৃদু উচ্চারণে একটি স্বপ্ন-উণ্মোচনের কথা শোনা যায়। কবি জানাচ্ছেন (হেমন্তের) দিন শেষ হয়ে গেলে সন্ধ্যা আসে, ধীরে, ধীরলয়ে শিশিরপাতের টুপটাপ শব্দের মতো। তখন (দিনভর আকাশচারী) চিলের ডানা থেকে রোদের গন্ধ মুছে যায়। এ সময় পাখিদের ঘরে ফিরে আসার তাড়া; এসময় (যেন) সব নদীরও ঘরে ফেরার ব্যাকুলতা। পৃথিবীর সব আলো মুছে যায়; অন্ধকারে কেবল কয়েকটি জোনাকি জ্বলে। সারাদিনের জাগতিক সব লেনদেন সমাপ্ত হয়েছে; গল্পের পাণ্ডুলিপি তৈরি; তখন (কেবল) অন্ধকারে বনলতা সেনের মুখোমুখি বসে গল্প করার অবসর।

**বনলতা সেন কবিতায় তিনটি প্রাচীন নগরীর কথা বলা হয়েছেঃ-**

পাউনিতে পাওয়া সাতবাহন মুদ্রা দ্বারা প্রস্তাবিত, বিদর্ভ সাতবাহন সাম্রাজ্যের (প্রথম শতাব্দী পূর্বে - দ্বিতীয় শতাব্দীর) অংশ ছিল। বিদর্ভা বৌদ্ধ রাজবংশ দ্বারা শাসিত হয়েছিল খ্রিস্টীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ শতাব্দীতে। এটি দুটি শাখা নিয়ে গঠিত - প্রবর্তাপুর নন্দীবর্ধন এবং ভাতসগলমা (বর্তমানে ওয়াশিম নামে পরিচিত) শাখাগুলি। প্রবর্তাপুর নন্দীবর্ধন শাখা ওয়ারধা জেলার প্রভারাপুর (পাওনার) এবং নাগপুর জেলার মানসার ও নন্দীবর্ধন (নগরর্ধন) এর মতো বিভিন্ন রাজধানী থেকে শাসিত ছিল। এই শাখা গুপ্তদের সাথে বৈবাহিক জোট বজায় রাখতে ব্যবহৃত হত। তাঁর মৃত্যুর পরে প্রবাসসেনের দ্বিতীয় পুত্র সর্বসেনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভটসগলমা শাখা। সর্বসেনা ভাতসগলমা (বর্তমান ওয়াসিম )কে তার রাজধানী করেছিলেন। এই শাখার দ্বারা শাসিত অঞ্চলটি সহিত্রি রেঞ্জ এবং গোদাবরী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল ছিল। তারা অজন্তায় কিছু বৌদ্ধ গুহাগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। প্রভাবতীগুপ্ত ছিলেন ভোকাকা সাম্রাজ্যের রানী ও অভিভাবক। তাঁর পিতা গুপ্ত সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এবং তাঁর মা নাগের কুবেরানাগা। তিনি ভোকাকার দ্বিতীয় রুদ্রসেনকে বিয়ে করেছিলেন। 385 সালে তাঁর মৃত্যুর পরে, তিনি তার দুই যুবক পুত্র, দিবাকরসেন এবং দামোদরসেনের জন্য বিশ বছরের জন্য রাজত্ব করেছিলেন , এই অঞ্চলটির নামকরণ করা হয়েছে মহাভারতে বর্ণিত পৌরাণিক বিদর্ভ

বিদর্ভ এটি ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চল, নাগপুর বিভাগ এবং আম্রাবতী বিভাগ নিয়ে গঠিত। অমরাবতী বিভাগের পূর্ব নাম বেরার (মারাঠি ভাষায় ভারহাদ)। এটি মোট ক্ষেত্রের ৩১..6% দখল করে এবং মহারাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার ২১.৩% হ'ল। এটি উত্তরে মধ্য প্রদেশ রাজ্য, পূর্বে ছত্তিশগড়, দক্ষিণে তেলেঙ্গানা এবং পশ্চিমে মহারাষ্ট্রের মারাঠওয়াদা ও খন্দেশ অঞ্চলকে সীমানা করে। মধ্য ভারতে অবস্থিত। বিদর্ভের বৃহত্তম শহর হ'ল নাগপুর, তার পরে আম্রাবতী।

**বিদর্ভ নগরীঃ**

**বিদর্ভ**

**বিদিশা**

**শ্রাবস্তী**

**বনলতা সেন কবিতার সাথে বিদর্ভ নগরীর তাৎপর্যঃ**

হাজার বছর ধরে আসলে কে পথ হাঁটে? এটাকে কি আক্ষরিক বলে ধরে নেব আমরা? সেক্ষেত্রে তো প্রশ্ন জাগেই - একজন মানুষ 'হাজার বছর ধরে' পথ হাঁটে কীভাবে? সেটি যেহেতু সম্ভব নয়, তাই কথাটিকে আক্ষরিক বলে ধরে নেবারও সুযোগ নেই। তাহলে কি দীর্ঘ ভ্রমণের ইমেজ আনার জন্য কথাগুলো বলা হয়েছে? হাজার বছর ধরে পথ হাঁটা, বা সমুদ্রে ঘোরা, বা সুদূর অতীতে বাস করার এই ভাষ্যগুলো কি নিছক একজন পথিকের পথচলার বিবরণ আর পথচলাজনিত কারণে তৈরি হওয়া ক্লান্তির অনুভূতি পাঠকের মনে ছড়িয়ে দেবার কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে? নাকি অন্য কোনো মানে আছে এর? আমার কাছে মনে হয়েছে, এটা নিছক একজনমাত্র পথিকের পথচলার বিবরণ নয়। বরং হাজার বছর ধরে যারা এই পথে হেঁটে গেছে, যারা সাগর-সমুদ্রে ঘুরে বেড়িয়েছে, এমনকি 'বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে' যারা ছিলো বা ছিলো 'আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে' - এই বর্ণনাটি তাদের সবার। আর এই সব মানুষই দীর্ঘপথ পেরিয়ে যখন ক্লান্তপ্রাণ হয়ে গেছে, যখন তাদের 'চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন' তখন তাদেরকে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছে 'বনলতা সেন'।

এখানে পথিক যেমন কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি নয়, 'বনলতা সেন'ও তেমনই নির্দিষ্ট কেউ নয়। এটি কেবলই একটি নাম, যেটি বহন করছে ক্লান্ত মানুষের মোহন আশ্রয়ের প্রতীক। এইভাবে দেখলে আমার সুবিধা হয়, নিজেকেও ওই হাজার বছর ধরে পথচলা পথিকদের একজন বলে ধরে নিতে পারি। ভাবতে পারি, আমারও একজন 'বনলতা সেন' থাকলে চমৎকার হতো, আমার সমস্ত ক্লান্তি, সকল বেদনা ও হাহাকার আমি তাকেই সমর্পণ করে দুদণ্ড শান্তি পেতাম!

**বিদিশা নগরীঃ**

বিদিশা ভারতের মধ্য প্রদেশ রাজ্যের একটি শহর ও পৌরসভা এলাকা।১৯০৪ সালে বিদিশা (ভিলসা নামেও পরিচিত) ও বাসোদা তহশিলগুলি যোগ করে এটি "ভিলসা জেলা" হিসাবে তৈরি করা হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার পরে, প্রাক্তন দেশীয় রাজ্য গোয়ালিয়র মধ্য ভারত প্রদেশের অংশে পরিণত হয়, যা ১৯৪৮ সালে গঠিত হয়েছিল। ১৯৪৯ সালে ছোট দেশীয় রাজ্য কুরওয়াই প্রদেশের সংযুক্তিতে ভিলসা জেলা সম্প্রসারিত হয়। জেলাটি ১৯৫৫ সালে তার বর্তমান রূপ গ্রহণ করে, যখন মধ্য ভারত প্রদেশ, ভোপাল প্রদেশ এবং তৎকালীন রাজস্থানের অংশ এবং পূর্বের টঙ্ক প্রদেশের অংশ সিরোঞ্জের তহসিল মধ্য প্রদেশে একীভূত হয়। ভোপাল প্রদেশ থেকে সিরোঞ্জ তহশিল এবং পিকলনের ছোট্ট পরগনা বিদিশা জেলায় একীভূত হয়।

**বনলতা সেন কবিতার সাথে বিদিশা নগরীর তাৎপর্যঃ**

বনলতা সেন কবিতার এই লাইনে "বিদিশার নিশা"-এর সাথে কবি বনলতার নিকষ ঘনকালো চুলের তুলনা করেছেন। বিদিশা হল প্রাচীন শহর। সেই শহরের অন্ধকার রাতের মতই নায়িকার কেশ কালো।

তবে এখানে আরো কথা আছে। কবি কী করে জানলেন বিদিশা শহরের রাত অত কালো? কেন কবি অন্য কোন শহরের রাতের সাথে বনলতার চুলের তুলনা করেননি, যেমন, হরপ্পা, ইলোরা, অজন্তা ইত্যাদি? জীবনানন্দ দাশ এই শহরের নামটি মূলত পেয়েছিলেন সংস্কৃত ভাষায় লেখা কালিদাসের "মেঘদূত" কাব্যগ্রন্থ থেকে যেখানে বিদিশার নিশার কথা বিস্তারিত উল্লেখ আছে। কবির অনুজ অশোকানন্দ দাশের লেখা থেকে জানা যায় কবি স্কুলে থাকতেই সংস্কৃত ভাষায় এই কাব্যগ্রন্থটি পড়েছেন।

এই কাব্যগ্রন্থের একটি লাইন হল, "সকল উপাচারে কামুকবৃত্তির পূর্ণফল" (বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ)। বিদিশা মূলত দশার্ণদেশের রাজধানী ছিল। সেকালে এই নগর ছিল পাপাচারের কেন্দ্র। পেশাদার গণিকাবৃত্তিতে এই শহর নাম করে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে রাত্রি হলেই নগর চঞ্চল হয়ে উঠত, বারবনিতাদের নিয়ে পুরুষরা লাগামহীন কমোন্মাদনায় মেতে উঠত। বিদিশার নিশায় সেই বেশ্যাদের দেহ হতে ভেসে আসতো পরিমলের গন্ধ। পরিমল বলতে পেষণ-মর্দনজনিত গন্ধ। বনলতাকে উদ্দেশ্য করে কবি বলছেন, "চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা। অর্থ্যাৎ, বিদিশা নগরের নিশিকালে বেশ্যাদের দেহ হতে যে গন্ধ ভেসে আসতো, তেমনি গন্ধ বনলতার চুলে। মানে দাঁড়ায়, পাপাচারে লিপ্ত নগরীর সাথে তুলনা করতেই শুধুমাত্র কালো চুলের কথা বলা হয়নি, বেশ্যাবৃত্তির সাথে এর বেশ যোগসাজশ রয়েছে। অনেক গবেষকের দ্বিমত সত্ত্বেও, এর থেকে বহু গবেষক অনুমান করেন, বনলতা সেন কবির দুর-সম্পর্কের বোন ছিলেন না, ছিলেন মূলত গণিকা যার কাছে গিয়ে কবি "দুদণ্ড শান্তি" পেয়েছেন বলে কবিতায় উল্লেখ করেছেন।

এই তথ্যগুলো আমি পেয়েছিলাম ডঃ আকবর আলি খানের "চাবিকাঠির খোঁজে- নতুন আলোকে জীবনানন্দের বনলতা সেন" বই থেকে।

স্বভাবতই আমার উত্তর অনেকের পছন্দ হয়নি। অনেকেই আবার পছন্দ করেছে। যারা করেনি তাঁদের বেদনা হয়ত অন্যখানে। এতকাল প্রেমিকাকে মুগ্ধ করেছেন এই কবিতা দিয়ে। বনলতার ভিন্ন পরিচয়ে নিশ্চয়ই তাঁরা আর স্বস্তিতে নেই। প্রায় নব্বই বছর পর কবিতার বিশ্লেষণ ইতিহাস চর্চার মতই। কালে কালে অনেক গবেষক আসবেন এক এক প্রকার তত্ত্ব আর তথ্য নিয়ে। সুতরাং হতাশ হওয়ার কিছু নেই বলেই মনে করি।

**শ্রাবস্তী নগরঃ**

শ্রাবস্তী হচ্ছে কোশল রাজ্যের এক সমৃদ্ধশালী নগরী। প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের শুরু খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে। এর আগেও যে প্রাচীন ভারতে রাজনৈতিক ইতিহাস ছিল না তা নয়, তবে সেই ইতিবৃত্তটি আজও তেমন স্পষ্ট নয়। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের দিকে প্রাচীন ভারতে ষোলোটি স্থানীয় রাজ্য গড়ে উঠেছিল। এই রাজ্যগুলির নাম বৌদ্ধগ্রন্থ অঙ্গুত্তর নিকয় তে পাওয়া যায়। বৌদ্ধসাহিত্যে এই রাজ্যগুলিকে ষোড়শ মহাজনপদ বলে অবহিত করা হয়েছে। এই ষোড়শ মহাজনপদগুলি হল: 'কাশী, কোশল, অঙ্গ, মগধ, বজ্জি, মল্ল, চেদি, বৎস, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস, সুরসেনা, অস্মক, অবন্তী, গান্ধার এবং কম্বোজ। গঙ্গার উত্তরে ছিল কোশল রাজ্য। এই রাজ্যেরই এক সমৃদ্ধশালী নগরী ছিল শ্রাবস্তী।

ভারত উপমহাদেশের মহাকাব্য রামায়ণ এর সূত্রপাত কোশল রাজ্যের অযোধ্যা নগরীটি থেকেই। বাল্মীকি একবার প্রশ্ন করেছিলেন, সম্প্রতি পৃথিবীতে যথার্থ গুণবান কে আছেন, বলুন তো? প্রত্যুত্তরে দেবর্ষি নারদ বললেন, মর্ত্যে সর্বগুণের আধার একজনকেই আমি জানি। তিনি ইক্ষ্বাকুবংশজাত রাম নামে এক রাজা। …স্রোতস্বতী সরযু নদীর তীরে ধনধান্যসমৃদ্ধ, আনন্দকলরোলমুখরিত কোশল নামে এক জনপদ আছে। ত্রিভুবনখ্যাত অযোধ্যা তাঁর নগরী। রাম এর জন্ম সেই অযোধ্যা নগরীতে হয়েছিল। [৪] রাম এর দুই পুত্রের একজনের নাম লব। তাঁর জন্যই একটি নতুন নগরী নির্মাণ করা হয়েছিল; সে নগরীর নাম ছিল শ্রাবস্তী। রাম কোশল রাজ্যটি দুভাগে ভাগ করে দিয়েছিলেন। লব পেয়েছিলেন শ্রাবস্তী নগরী এবং জ্যেষ্ঠপুত্র কুশ পেয়েছিলেন কুশবতী নগরী। কুশবতী কোশল রাজ্যের অন্য একটি নগরী। মহাভারতের তথ্য অনুযায়ী শ্রাবস্তী নগরীর গোড়াপত্তন করেছিলেন কিংবদন্তিতুল্য সম্রাট শ্রাবস্ত।

**বনলতা সেন কবিতার সাথে শ্রাবস্তী নগরীর তাৎপর্যঃ**

কবি জানাচ্ছেন সে নাটোরের বনলতা সেন। কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকে বনলতা সেনের আশ্চর্য নান্দনিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন কবি। বনলতা সেনকে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন অন্ধকারে। তার কেশরাজি সম্পর্কে কবি লিখেছেন : "চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা"; মুখায়ব প্রতীয়মান হয়েছে শ্রাবস্তীর কারুকার্যের মতো।

কবি তাঁর অপরূপ সৌন্দর্যের উজ্জ্বল বর্ণনা দিয়ে তাঁকে বাস্তব, জীবন্ত, সবাক সত্তায় পরিস্ফুট করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি বনলতা সেনের মুখকে ‘শ্রাবস্তীর’ সঙ্গে তুলনা করে একজনের মুখকে সুদূর রহস্যময় শিল্পকলায় পরিণত করেছেন। কেননা ‘শ্রাবস্তী’র ভাস্কর্য অলৌকিক দৃশ্যকে ধারণ করে আছে। তবে তা সৌন্দর্যের পশরা সাজানো পরিপাটি গোছের।প্রতিটি ভাস্কর্য যেন শিল্পীর মনের মাধুরী মিশিয়ে গড়ে তোলা। সহজ স্বাভাবিক গড়নের এবং সৌন্দর্যের প্রকাশ মূর্তিগুলোর সাবলীল অঙ্গবিন্যাস, নিখুঁত সম্পাদন এবং বাস্তবের ভিত্তির উপর অতীন্দ্রিয় রসসৃষ্টি করে শ্রেষ্ঠত্বের বিকাশ ঘটিয়েছে। শ্রাবস্তীর এই কারুকার্য কি আমাদেরকে বনলতা সেনের সৌন্দর্যের কথা মনে করিয়ে দেয় না? পরোক্ষে আমাদেরকে কি রানী ভবানীর সৌন্দর্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় না? কেননা পুরাণের ‘পরমাপ্রকৃতি’ ভবানীর মতো রানী ভবানীও ছিলেন ‘সুন্দরী, সুলক্ষণা’ এবং ‘ঐশ্বর্যশালিনী’ রমণী যার সৌন্দর্য নিয়ে প্রচলিত আছে নানা মিথ।